মূলপাতা

এই অদ্ভুত অনুভূতি

Shihab Ahmed Tuhin

March 28, 2020
8 MIN READ

বছর দেড়েক আগের কথা। তখন চাঁপাইনবাবগঞ্জে থাকি। যেখানে চাকরী করতাম সেখানে টানা বারো দিন ডিউটি থাকত। চারদিন রাতে, চারদিন দুপুরে, চারদিন সকালে। গড়ে আট ঘন্টা করে ডিউটি। এভাবে ডিউটি করার কারণে শরীরের বারোটা বেজে যায়। ঠিকমত ঘুম আসে না, কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। পৃথিবীটা একদম অসহ্য লাগে। শেষ দুইদিন একদমই কাজে মন বসে না। তার ওপর ডিউটির শেষ দিনেই ঠিক করেছি দিনাজপুর যাব। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে দিনাজপুর। দুটো জেলাই উত্তরবঙ্গে। কিন্তু এক জেলা থেকে আরেক জেলায় যেতে খবর হয়ে যায়।

যেদিন মন বিক্ষিপ্ত থাকে সেদিনই কেন যেন কাজের প্রেশার বেশি থাকে। সেদিন প্লান্ট শাট ডাউন থেকে ইঞ্জিন রেডি করতে হলো, সেদিনই ইঞ্জিন ট্রিপ করল। টেকনেশিয়ান না আসায় পিক প্রেশারও নিতে হলো। কাজে মনোযোগ না থাকায় পিক প্রেশার নেয়ার সময় দুইটা আঙ্গুলের চামড়ার বেশ খানিকটা পুড়িয়ে ফেললাম। হুট করে তাকালে মনে হয় কেউ যেন আঙ্গুলের এ অংশ দুটি গ্রিল করেছে। শসা দিয়ে নান-রুটি মাখিয়ে খেয়ে ফেলা যাবে।

পুড়ে যাওয়া হাত নিয়েই শুরু করলাম জার্নি। প্রথমে প্লান্ট থেকে দশ মিনিট হেঁটে আমনুরা বাসস্ট্যান্ডে গেলাম। সেখান থেকে ‘নওগাঁ মেইল’- বাসে চড়ে নওগাঁ বাসস্ট্যান্ডে। নওগাঁ শহরে নেমে একটু অবাক হলাম। প্রথম পা দেওয়া নওগাঁতে। এতো ভীড় আশা করি নি। মনে হলো রাজশাহীর চেয়েও নওগাঁ বেশি ব্যস্ত। নওগাঁ থেকে অটোতে করে সোজা সান্তাহার রেলওয়ে স্টেশন। দূর থেকে সান্তাহার রেলওয়ে স্টেশনকে দেখলে মনে হয় এটা বাংলাদেশ না পশ্চিমবঙ্গের কোনো রেলওয়ে স্টেশন। আগে যখন ভারতীয় বাংলা ছবি দেখতাম তখন এ ধরনের রেলওয়ে স্টেশন খুব চোখে পড়ত মুভিগুলোতে।

যে ভদ্রমহিলা ট্রেনের টিকেট দিচ্ছেন, কোনো কারণ ছাড়াই কেন যেন সবাইকে ঝাড়ি দিচ্ছেন। আমি দিনাজপুরের ‘ফুলবাড়ি’- স্টেশনের কথা বলতেই বাজখাই গলায় বলল, সিট নাই। দাঁড়িয়ে যান।
আমি বিরক্ত গলায় বললাম, সিট লাগবে না। আপনি যেটা আছে সেটাই দিন।
আমার গলায় বিরক্তি শুনে উনি একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। উনি সম্ভবত বিরক্তি দিয়ে অভ্যস্থ, পেয়ে না।

মনে হয়েছিল ট্রেনে অনেক ভীড় হবে। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার কোনো ভীড় নেই। আমি যে বগিতে উঠলাম সেটা অর্ধেক খালি। পৌনে এক ঘন্টা পর প্রায় খালিই হয়ে গেল। আমায় কেন সিট দিলো না আল্লাহই জানেন। মুখোমুখি দুইজন করে চারজন বসে যাবে এমন সিট। আমি দুইজনের সিটে একাই বসে আছি। আমার বিপরীতে আরেক মহিলাও দুইজনের সিটে একা বসে আছেন। তার সাথে এক ভদ্রলোক মহিলার ভেন্টি ব্যাগ হাতে নিয়ে অপরাধী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে চমকে গেলাম। অবিকল আমার মেঝো খালার মতো চেহারা। পার্থক্য হচ্ছে, আমার খালার চেহারা সবসময়ই হাসিখুশি থাকে আর এই মহিলাকে দেখেই বুঝা যাচ্ছে ভয়ংকর রেগে আছেন। একটু পরপর প্রায় বিনা কারণেই ভদ্রলোককে ঝাড়ি দিচ্ছেন। কালো বোরখা পরে আছেন। শুধু মুখটা খোলা।

আমি মহিলার চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে বাইরে তাকালাম। ঝপ করেই দেখি অন্ধকার হয়ে গেছে চারপাশটা। কেমন ঠাণ্ডা বাতাস। বৃষ্টি আসার আগে যেমন বাতাস থাকে ঠিক তেমন। অনেক চিন্তা মাথায় আসায় মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। অযু থাকায় আর সিটও খালি পাওয়ায় ভাবলাম মাগরিবটা এখানেই পড়ে ফেলি। স্যান্ডেল খুলে দাঁড়িয়েই নামায পড়া যাবে। নামায পড়ার পরেও দেখি মন ভালো লাগছে না। ওদিকে ভদ্রমহিলার ক্রমাগত বকবকানিতে একটু মেজাজও খারাপ হচ্ছে। ছেলের সাথে ফোনে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছেন। স্বামীর বোকামি নিয়ে একগাদা অভিযোগও করছেন।

প্রত্যেক জার্নিতেই সাথে কিছু বই থাকে। এবার নিয়েছি আরিফুল ইসলাম ভাইয়ের ‘প্রদীপ্ত কুটির’- বইটা। স্বামী-স্ত্রীর রোমান্টিক

কাহিনী দিয়ে ভরা। কোন দুঃখে এই বই নিয়ে আসলাম আল্লাহই জানেন। পড়ে আরো মন খারাপ হচ্ছে। ভাইয়ের লেখার স্টাইল সুন্দর হওয়ায় খুব মন দিয়েই বইটা পড়ছিলাম। হুট করে দেখি ভদ্রমহিলা কাকে যেন একদম নরম গলায় বলছেন, শুনছেন। একটা কথা ছিল। আপনি শুনছেন আমার কথা!

এভাবে তো তার পতিকে জীবনেও ডাকার কথা না। তাকিয়ে দেখি আমাকেই ডাকছেন। হাসিমুখে বললেন, একটা প্রশ্ন ছিল। মহিলার হাসি দেখে আবারো চমকে গেলাম। আমার খালাও ঠিক এভাবে হাসেন। প্রাণখোলা হাসি। কী বিচিত্র এই পৃথিবী! আশে পাশে উনার বেচারা স্বামীকে দেখতে পাচ্ছি না। আমিও হাসিমুখে বললাম, জ্বী! বলুন।

উনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মাদ্রাসার শিক্ষক।
আমি মাথা নেড়ে বললাম, জ্বি না। আমি সাধারণ একটা চাকরী করি। পাওয়ার প্লান্টে।
ভদ্রমহিলা বললেন, পাওয়ার প্লান্ট কী জিনিস।
আমি একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম উনাকে কী উত্তর দেব। কী উত্তর দিলে উনি বুঝবেন। শেষে বললাম, কারেন্টের নাম শুনেছেন না! যেটা দিয়ে ফ্যান, বাতি চলে। সেটা আমরাই বানাই।

ভদ্রমহিলা আরো খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তার মানে আপনি ইঞ্জিনিয়ার? আমার ছেলেও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। রাজশাহী পলিটেকনিকে। কম্পিউটার নিয়ে।
বললাম, ও আচ্ছা। রাজশাহী পলিটেকনিক বেশ ভালো।
উনি বললেন, আপনি কোথায় পড়েছেন?
বললাম, খুলনার একটি ভার্সিটিতে পড়েছি।
- ওটা কি সরকারি রাজশাহী পলিটেকনিকের মতো।
- জ্বি, মনে হয় সরকারিই।

ভদ্রমহিলা উৎসাহী গলায় গিজ্জেস করলেন, দাড়ি-পাঞ্জাবি কবে থেকে রাখেন? আপনি মাদ্রাসায় পড়েছেন ছোট থাকতে?
বললাম, জ্বি না। ভার্সিটিতে যেয়ে রেখেছি। ধর্ম নিয়ে একটু পড়াশুনা করার পর ধর্ম মানতে ইচ্ছে হলো। সে থেকেই।
ভদ্রমহিলা আরো আগ্রহ নিয়ে বললেন, তাহলে তো আপনার ভালো পড়াশুনা আছে ধর্ম নিয়ে।
আমি মাথা নেড়ে বললাম, জ্বি না। একদমই না।
উনি যেন আমার প্রশ্ন শুনতে পান নি এমন গলায় বললেন, আচ্ছা! আমি কয়দিন ধরে চেষ্টা করি সবসময় পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে। এবার হজ্জও করব ইন শা আল্লাহ। কিন্তু অনেক সময় রাস্তায় বাসে-ট্রেনে থাকলে নামায ছুটে যায়। কী করব বলেন দেখি? আপনাকে দেখলাম ট্রেনের মধ্যেই দাঁড়িয়ে কী সুন্দর নামায পড়ে ফেললেন। আমরা মেয়েরা তো এমনটা পারি না।

আমি বললাম, জোড়া লাগিয়ে পড়বেন।
উনি কৌতূহল নিয়ে বললেন, জোড়া কীভাবে লাগায়।
বললাম, জোড়া মানে যোহর একটি দেরীতে পড়ে যোহর-আসর একসাথে পড়বেন। আবার মাগরিব একটু দেরীতে পড়ে মাগরিব-ইশা একসাথে পড়বেন। যেহেতু, মুসাফির তাই চার রাকাত নামায দুই রাকাত পড়বেন। আমার সুযোগ ছিল বলে মাগরিবটা পড়ে নিলাম। না হয় আমিও জোড়া লাগিয়ে পড়তাম।
উনি বললেন, চার রাকাত নামায দুই রাকাত পড়লে গুনাহ হবে না।
বললাম, জ্বি না। বরং চার রাকাত পড়লেই গুনাহ হবে। আল্লাহরই নির্দেশ এটা।

আমি বাসে-ট্রেনে অপরিচিত কারো সাথে কথা বলে অভ্যস্থ না। উনার সাথে কথা বলে ভালো লাগছিল। পরিচিত কারো সাথে চেহারায় মিল আছে বলেই হয়তো। শুধু একটু খারাপ লাগল যে, পঞ্চাশের কাছাকাছি বছর হবার পরেও তিনি কসরের সালাতের নিয়ম জানেন না।

একটু পরেই ভদ্রমহিলার স্বামী চলে আসায় উনি সাথে সাথেই হাসিমুখ থেকে পলকের মধ্যেই রুদ্রমুখে চলে গেলেন। দেখে কে বলবে, এই মহিলা এতো সুন্দর করে হাসতে পারেন। এর মধ্যে ট্রেন জয়পুরহাটের পাঁচবিবি স্টেশনে চলে আসল। 'পাঁচবিবি'- নাম কোন দুঃখে দিয়েছে আল্লাহই জানেন। বড়োজোর তো 'চারবিবি'- হতে পারে। ট্রেন আরো খালি হয়ে যাচ্ছে। আমি চোখ বন্ধ করলাম একটু। জানি ঘুম আসবে না তাও।

আমি ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবেই কিনা, ভদ্রলোক এবার পত্নীর রাগ ভাঙ্গানোর চেষ্টা করলেন। এমন কাণ্ডকারখানা শুরু হলো যে, নিজেকে একটু অপরাধী লাগছিল এসব ব্যক্তিগত কথা শুনছি বলে। মনে হলো, ঘুম চলে এলেই ভালো হতো।

ভদ্রলোক সম্ভবত হাত ধরার চেষ্টা করছিলেন স্ত্রীর। কিন্তু উনি ঝট করে হাত সরিয়ে গেলেন। ঠোঙ্গায় করে বাদাম না কী যেন নিয়ে এসেছিলেন। ভদ্রমহিলা বেশ শব্দ করে ওই ঠোঙা ফেলে দিলেন। কাগজের জিনিস এতো শব্দ করে ফেলা যায় জানতাম না। হিসহিস করে বললেন, খবরদার আমাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করবে না। তুমি তোমার ভাইয়ের বউকে ছোঁও গে।
ভদ্রলোক বললেন, কী আশ্চর্য। ওকে ছুঁতে যাব কেন! ও কি আমার বউ লাগে নাকি!
- ছুবে কেন! ঢঙ্গ কতো। ঠিকই তো দেখলাম দাঁত কেলিয়ে দুজন গল্প করছ।
- আরে ও তো এমনই। হেসে হেসে কথা বলে।
- আর আমি! আমি তো হাসতেই জানি না!
- ভারী মুশকিল তো। সে কথা কখন বললাম।
- আজকে আমি একা একা ট্রেনে উঠেছি। তুমি হাত দিয়েও উঠাও নাই আমাকে। দেখো নাই এমন ভাব। কেন! তোমার পিরিতের ভাবি দেখবে বলে। আর এখন এসেছ হাত ধরতে। ঢঙ্গ করতে। বুড়ো ভঙ্গ কোথাকার! যাও সামনে থেকে। আরে তুমি পাশে বসার চেষ্টা করছ কেন! বললাম না, তুমি বসলে সাথে সাথে ট্রেন থেকে নেমে যাবো। কেন বসলে তুমি!
- আরে বসি নি তো। সিটটা মুছে দিলাম। ধুলো পড়ে গিয়েছিল।
- ন্যাকামি ছাড়ো। ট্রেন থেকে নেমেই আমি বাবার বাসায় চলে যাব।
- ঠিক আছে আমিও না হয় তোমার সাথে বাবার বাসায় থাকব।
- একদম চুপ। হাঁদারাম কোথাকার। আরেকটা কথা বললে ট্রেন থেকে লাফ দিবো।

ঝগড়া আরো ক্লাইমেক্স পর্যায়ে যাওয়ার আগেই কীভাবে যেন আমি ঘুমিয়ে গেলাম। একটু অবাকই হলাম। জার্নি করার সময় আমি খুব একটা ঘুমাই না। ভদ্রমহিলার ডাকে ঘুম ভাঙ্গল। উনি হাসিমুখে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, কই নামবেন আপনি?
ঘুম জড়ানো গলায় বললাম, ফুলবাড়ি।
উনি বললেন, ফুলবাড়ি তো চলে এসেছি প্রায়। রেডি হোন তাড়াতাড়ি।

রেডি হবার কিছু ছিল না। কোলে একটা ব্যাগ। সেটা নিয়েই নেমে পড়ব। ভদ্রমহিলার সাথে এখন তার স্বামী বসে আছেন। অবাক হয়ে দেখলাম, দুজন এখন হাসিমুখে গল্প করছেন। মেয়ের জন্য উনারা রাজশাহীতে একটা পাত্র দেখেছেন। ছেলে ভালো, চেহারা নাকি একটু বোকা বোকা। ছেলে হিসেবে কেমন হবে তাই নিয়ে স্বামী-স্ত্রী আলাপ করছেন। দেখে কে বলবে, তারা একটু আগে এতো ঝগড়া করেছেন। নেমে আসার আগে বললাম, আমি আসছি খালা! দু'আ করবেন আমার জন্য।
আশ্চর্য! অচেনা মহিলাকে খালা ডাকলাম কেন! আমি তো 'আন্টি'- ডেকে অভ্যস্থ।
ভদ্রমহিলা শুনলেন কিনা জানি না। তিনি আগের মতোই স্বামীর সাথে গল্প করছেন। মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে হেসে উঠছেন।

ট্রেন থেকে নেমেই প্রতিবার যা করি তাই করলাম। এক কাপ গরম চা খেলাম। স্টেশনের এক জায়গায় দেখি, এক পঙ্গু লোককে এক মহিলা ভাত খাওয়াচ্ছেন। এক লোকমা নিজে খাছেন, দুই লোকমা লোকটাকে খাওয়াচ্ছেন। বয়স দেখে মনে হয় স্বামী-স্ত্রী হবে। পৃথিবীটা বড়ো অদ্ভুত। মানুষের ভালোবাসাগুলোও বড়ো অদ্ভুত। যতো মানুষের সাথে মিশেছি, যতো জায়গায় গিয়েছি- এই অদ্ভুত অনুভূতি যাকে অনেকে 'ভালোবাসা'- বলে, এর বিচিত্র প্রকাশে কেবল অবাকই হয়েছি।

তবে তখনো জানতাম না, অবাক হবার মতো আরো বড়ো কিছু সামনে অপেক্ষা করছিল। সবসময় যে এ গল্প মানুষকে আনন্দ দেয় তা কিন্তু না, মাঝেমাঝে তিক্ততাও দেয়।

সে গল্প হয়তো আরেকদিন বলব। কিংবা কে জানে! হয়তো কোনোদিনই বলা হবে না।

* * *

Friday, 27 March 2020 at 23:35